আর্টফাইন, ভল্যুম-০৫, জুন-২০২১, পৃ. ৩৫ - ৬০

ঢাকার অলংকার শিল্পের নান্দনিক বৈচিত্র্য

ফারহানা তাবাস্‌সুম*

[**সার-সংক্ষেপ :** ইতিহাসের কাল পরিক্রমায় ঢাকা নগরীর বেড়ে ওঠার ঘটনা যেমন চমকপ্রদ তেমনি আকর্ষণীয় ঢাকার অলংকার শিল্পের জাঁকজমকপূর্ণ যাত্রা। এই যাত্রা গড়ে তোলে এক স্বকীয় শিল্পধারা যা অতীতেও ছিল এবং বর্তমানকালেও বিদ্যমান। প্রাচীনকালে বাংলায় অলংকার ব্যবহারের দৃষ্টান্ত পাওয়া গেলেও ঢাকার নিজস্ব শৈলী ও ধরন-গড়ন প্রতিষ্ঠিত হয় মূলত মুঘল আগমনের পরই। এই গবেষণার মূল লক্ষ্য হচ্ছে, ঢাকার অলংকার শৈলীর ক্রমবিবর্তন এবং নানা আঙ্গিকে বিচ্ছুরিত এর বৈচিত্রতা ও নান্দনিক বিশ্লেষণ। যুগ যুগ ধরে ঐতিহ্যবাহী ঢাকার অলংকার শৈলীর গঠনগত পরিবর্তন আসলেও সৌন্দর্য বিচারে সর্বদাই উচ্চ আসনের মর্যদা পেয়েছে। মূলত ঢাকার অলংকার শৈলীর ক্রমবিকাশের ধারাবাহিকতা আলোকে এর সৌন্দর্য বিশ্লেষণ এবং বিভিন্ন মাধ্যমের অলংকারের বৈচিত্র্যপূর্ণ সম্ভার পর্যবেক্ষণে এর মাধ্যমে এ শিল্পের সম্ভাবনা, প্রচার ও প্রসার, নতুন প্রজন্মের কাছে এর গুরুত্ব তুলে ধরাই এ গবেষণার অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

মূল শব্দ : ঢাকার অলংকার, মুঘল, ঐতিহ্যবাহী, স্বকীয় শিল্পধারা।]

ভূমিকা

সৃষ্টির আদিকাল থেকেই মানুষের মধ্যে নিজেকে সাজানোর একটি প্রবণতা লক্ষ করা যায়। মূলত সেই তাড়না থেকেই অলংকারের উদ্ভব। প্রাচীনকালে মানুষ মাটি, পশুর হাড়, পাখির পালক, ফলের বীজ, গাছের পাতা, ডাল প্রভৃতি ব্যবহার করত অলংকার তৈরিতে। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন কালে মানুষের অলংকার পরার রীতি গড়ে উঠেছিল তা যে শুধুমাত্র সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য ছিল, তা নয়। বরং বিভিন্ন সংস্কার, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের সাথেও অলংকার পরার একটা গভীর সংযোগ রয়েছে।

ঢাকায় অলংকার শিল্পের বিকাশের প্রাক-পূর্ব আলোচনা

* **ফারহানা তাবাস্‌সুম :** সহকারী অধ্যাপক, চারুকলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

ঢাকা মহানগরীর শিল্প ঐতিহ্য গড়ে ওঠে বলতে গেলে মুঘল আমল থেকে, যদিও এসব শিল্পের উৎস-উপাদান এসেছে বহু প্রাচীন ঐতিহ্য থেকে। ঢাকার অলংকার শিল্পের উৎস সন্ধান করতে তাই আমাদের ফিরে যেতে হবে অনেক আগে ঐতিহাসিক নানা পর্যায়ে এর ধারাবাহিক পট-পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। এই অলংকার শিল্পের ইতিহাসও ঢাকার অন্যান্য শিল্পকর্মের মতই প্রাচীন ঐতিহ্যের বহু পথ-পরিক্রমার ও বিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে।

আমাদের এই উপমহাদেশের যুগ-যুগান্তরের সংস্কৃতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে অলংকার বাঙালি রমণীর যাপিত জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বাংলাদেশ এ উপমহাদেশের অংশ হিসেবে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে সৌন্দর্যকরণ ও সৌন্দর্য বিষয়ক প্রাচীন চিন্তা।[১] ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের কারণে নদীমাতৃক বাংলাদেশে স্থায়ী ও শক্ত উপাদান অনুপস্থিত। বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্ত ঐতিহাসিক নিদর্শনসমূহ যেমন পোড়ামাটির ফলক চিত্র, চিত্রিত পাণ্ডুলিপি প্রভৃতি বাংলার কারুশিল্পের গবেষণায় সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। একই সূত্র ধরে আমরা বাংলাদেশে অলংকার শিল্পের প্রাচুর্যময় অধ্যায় বিশ্লেষণ করতে পারি।

বাংলাদেশে অলংকার শিল্পের রয়েছে গৌরবময় ঐতিহ্য। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাচীনকালে যে সকল ভাস্কর্য পাওয়া গেছে সে সকল ভাস্কর্যের মাধ্যমেও অলংকার ব্যবহারের ধারণা পাওয়া যায়। মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত গজ-লক্ষ্মী, বিষ্ণু, পাহাড়পুরে প্রাপ্ত ইয়ামুনা, বলরাম, ইন্দ্রা, যুগল প্রভৃতি ভাস্কর্যে অলংকার ব্যবহার করা হয়েছে। পালযুগের ভাস্কর্যেও রয়েছে বিচিত্র ধরনের অলংকারের ব্যবহার। এ সময়ে নারী-পুরুষ উভয়েই অলংকার ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিলেন।[২]

পাহাড়পুর, ময়নামতিসহ ঐতিহাসিক স্থানগুলো খননকার্যের ফলে যে সকল অলংকারে সজ্জিত নরনারীর মূর্তি পাওয়া গেছে সে সকল মূর্তি অলংকার শিল্পের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির কথা ঘোষণা করে। এই অঞ্চলের মানুষ যে অলংকার শিল্পের প্রতি আগ্রহী ছিলেন এবং নানা জাতের অলংকার তৈরিতে আগ্রহী ছিলেন তা প্রমাণিত হয়েছে মহেঞ্জোদারো হরপ্পা সভ্যতায় প্রাপ্ত নিদর্শনসমূহের মাধ্যমে। সম্প্রতি ঢাকার সন্নিকটে উয়ারী-বটেশ্বর গ্রাম খননকালেও এমন কিছু উল্লেখযোগ্য নিদর্শন পাওয়া গেছে। বিভিন্ন স্থানে খননকার্যের ফলে প্রাচীন আমলের যে সকল গলার মালা পাওয়া গেছে উয়ারী-বটেশ্বরে প্রাপ্ত মালাও ঠিক সেরকমই। ছোট-বড় নানা রঙের পুঁতি, মুক্তার অনুরূপ আকৃতির এবং সামান্য বড় আকৃতির পাথর দানা ও কাঁচের গুটিকা সমন্বয়ে তৈরি একাধিক মালার নিদর্শন এখানে পাওয়া গেছে।[৩]

প্রাচীনতম কালের প্রাপ্ত পোশাক ও গহনার নিদর্শন থেকে এটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে এদেশের নারী ও পুরুষ উভয়ই বিভিন্ন ধরনের অলংকার ব্যবহার করতে পছন্দ করত। এ সমস্ত গহনার প্রকৃত উদাহরণের অভাবে কেবলমাত্র খ্রিস্ট পূর্ব ২য়-১ম

শতাব্দী হতে ৩য় খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশের মহাস্থানগড়, মঙ্গলকোট এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গের চন্দ্রকেতুগড় ও তাম্রলিপি থেকে প্রাপ্ত পোড়ামটির মূর্তি ও ফলক পর্যবেক্ষণ দ্বারা গহনার বৈচিত্র্যময় ঐতিহ্যমণ্ডিত এক সমৃদ্ধিশালী সমাজের উপস্থিতির কথা জানা যায়।[৪]

বগুড়ার মহাস্থানে প্রাপ্ত খ্রিস্টপূর্ব ২য়-১ম শতকে তৈরি নারীর মৃন্ময় মূর্তিতে উৎকীর্ণ অলংকার এদেশে প্রচলিত গয়নার প্রাচীনতম দলিল। মহাস্থানে প্রাপ্ত স্বর্ণালংকারের ছাঁচে তামার বালা ও আংটি এ শিল্পের প্রাচীনত্বের প্রমাণ। রংপুরের সাহেবগঞ্জে প্রাপ্ত অলংকারের ছাঁচ পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীর বলে অনুমান করা হয়। রাজশাহীর গোদাগাড়ীতে প্রাপ্ত ও জাতীয় জাদুঘরে রক্ষিত ৫ম-৬ষ্ঠ শতাব্দীতে স্বর্ণ-নির্মিত বাহুর অলংকার এক চমকপ্রদ নিদর্শন। অলংকারটিতে একজন নর্তকীর ছবি রিলিফে উৎকীর্ণ। ময়নামতির প্রত্নখননে প্রাপ্ত সোনা-রুপা ও ব্রোঞ্জের গয়নার মধ্যে আংটি, কানের অলংকার ও হাতের বালা আছে।[৫]

যুগে যুগে বিভিন্ন অলংকারের ব্যবহার প্রচলিত হয়ে তা আবার সাময়িকভাবে ফ্যাশন বহির্ভূত হয়ে পরিত্যক্ত হয়, পুণরায় তার প্রচলন হয়। তাতে করে একটি অতি প্রাচীন ধারা আমাদের অলংকারগুলোর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। অষ্টম শতাব্দীতে বাংলাদেশের প্রাচীন জনপদ পাহাড়পুরের রূপসীদের কর্ণে শোভা পেত কুণ্ডল, গলার হার, বাহুতে বাজু, নিতম্বে চন্দ্র ও সূর্যহার, পায়ে এবং হাতে বালা। এ প্রাচীন স্তূপে প্রাপ্ত শৃঙ্গাররত পুরুষ ও রমণীর ভাস্কর মূর্তিতে এ অলংকারগুলো দৃষ্ট হয়। একই রকম অলংকার তখন স্ত্রী-পুরুষের অঙ্গে শোভা পেত। নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার প্রাপ্ত বিগ্রহগুলোতে উৎকীর্ণ অলংকারগুলো দেখলে মনে হয় তখনো অঙ্গসজ্জার সে ধারা অক্ষুণ্ন ছিল। পরবর্তীকালে বিগ্রহ, চিত্রকলা, সাহিত্য, লোকগীতি প্রভৃতি থেকে এ দেশে প্রচলিত অলংকারগুলো সম্পর্কে জানতে পারা যায়।[৬]

বিদেশি পর্যটকদের বর্ণনা থেকেও অলংকার শিল্পের বর্ণনা পাওয়া গেছে। বর্ণনা মিলেছে বিভিন্ন গ্রন্থেও। এ সমস্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসহ বৈদেশিক বিবরণ, যথা-চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের দরবারে গ্রিক দূত মেগাসথিনিস এবং রোমের নাবিক ইরিত্রিয়ান সাগরের পেরিপ্লাস এবং প্রাচীন ধ্রুপদি রচনা যেমন– কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী, পতঞ্জলির মহাভাষ্য ইত্যাদিতে সে সময়ের সুবর্ণকারদের তৈরি বিভিন্ন ধরনের অলংকারের নাম পাওয়া গিয়েছে। এই সুবর্ণকারেরা তাদের কারিগরি নৈপূণ্য ও দক্ষতার জন্য সমাজে মর্যাদা পেয়েছিল।[৭]

বাংলার ৮ম থেকে ১৩শ শতাব্দীর কৃষ্ণ পাথরের ভাস্কর্যে সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য প্রচুর গহনা সজ্জিত করা হতো। এগুলো এতটাই সুবিন্যস্ত ছিল যে, অবাক করার মত হলেও এগুলোর অনেকগুলো মনে হয় যেন আজকের দিনের গহনা প্রস্তুতকারীরা অনুকরণ করেছে।[৮]

ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে বাংলার শিল্প-সংস্কৃতি ভিন্ন মোড় নেয়। যার বিস্তর প্রভাব পড়েছিল অলংকার শিল্পে। এ সময় তুর্কি-আফগান এবং পরে পারস্য থেকে আসা মুসলমানদের জোরালো প্রভাব আমাদের অলংকার শিল্পে যোগ করেছে নতুন মাত্রা। নতুনত্ব প্রদর্শনে এ অঞ্চলের অলংকার শিল্পীরা কখনো ইতস্তত করেনি। তারা অবিলম্বে সুন্দর সব অলংকার তৈরি করার জন্য গ্রহণ করেছিল নতুন পদ্ধতি ও নকশা যা তাদের পৃষ্ঠপোষকদের তুষ্ট করেছিল।[৯]

এরপরেই মূলত মুঘল শাসনামলে ঢাকার অলংকার শিল্পের বিচিত্র স্ফুরণ ঘটে। সুবা বাংলা অথবা বাংলা ছিল মুঘল সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধিশালী প্রদেশসমূহের একটি, যার মসলিন, শোরা ও অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্যের সমৃদ্ধ ব্যবসা-বাণিজ্য বিভিন্ন ধরনের কারিগর এবং শিল্পীদের আকর্ষণ করেছিল। এর রাজধানী জাহাঙ্গীরনগর বা মুঘল আমলের ঢাকা মসলিনের জন্য বিখ্যাত হয়েছিল এবং সে মসলিন মুঘল শাসনামলে উৎকর্ষের শিখরে পৌঁছেছিল। রাজপরিবারের ও অভিজাত পরিবারের মধ্যে মসলিনের ভীষণ চাহিদা ছিল এবং এ চাহিদা উপমহাদেশের গণ্ডি পেরিয়ে পাশ্চাত্যের দেশসমূহ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। ঢাকাই মসলিনের দক্ষ তাঁতিদের সাথে ঢাকার গহনা প্রস্তুতকারীরা তাদের তৈরি সুন্দর দ্রব্যের জন্য পূর্ব ভারতে সুপরিচিত হয়ে ওঠে, বিশেষত এ যুগের চুলের মত সুক্ষ্ম স্বর্ণ ও রৌপ্যের তারের জটিল নকশার তৈরি নতুন ধরণের অলংকারগুলোর জন্য যা ফিলিগ্রী বা তারজালি নামে পরিচিত।[১০]

অঙ্গশোভায় বৈচিত্রময় নান্দনিক অলংকার

প্রতিটা অঙ্গের জন্য আলাদা করে অলংকার তৈরি হত। যা থেকে বোঝা যেত অলংকার শৈলীর নান্দনিক বৈচিত্র্য। আমাদের লোকজ সাহিত্যে, সংগীতে প্রায়ই অষ্টালংকারের বর্ণনা পাওয়া যায়। এ সমস্ত অলংকারের রয়েছে বিবিধ নাম ও ব্যবহার। বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রচলিত ও লুপ্ত অনেক রকমের অলংকারের নাম পাওয়া যায়।

- মাথার অলংকার– সিঁথি, অলকা, সিঁথিপাটি, শীরবন্দী বা চৌবন্দী মাথার অলংকার। এতে তিন লহর শিকল থাকত, দু'গাছি দু'কানের দিকে এবং এর লহর সিঁথির মাঝখানটাতে ঝোলান থাকত। টিকলি, ললাটিকা একটি শিকল দিয়ে সিঁথির মাঝখানে ঝোলান হয়। খুজিকাঠি চুলের কাঁটার নাম। মল্লিকা, করামালা, মাথামালিশ এবং দেউনরিয়া খোঁপার চারপাশে পরিহিত হত। তাছাড়া গর্ভক, লালামক, আপীড়, পালাপাষ্যা, পরিতথ্যা, হংসতিলক, দণ্ডক, চূড়া মণ্ডা, চূড়িকা, লম্বন, মুকুট, টায়রা, কলগি, ঝাপটা, পাশ চিরুনি, ঝাপ, শীষফুল, বেনা, বান্দী, শিহারা প্রভৃতি মস্তকের অলংকার।
- নাকের অলংকার– বেশব, নথ, নোলক, বোলাক, বালি, চমক বালি, নাকফুল, নাকচাবি, বিজলী, ফুলগোনা, ময়ূর গোনা, ভাঙ্গী প্রভৃতি।

- ❖ কানের অলংকার– কুন্দল, মাকড়ী, টপ, দুল, মকর কুণ্ডল, কানবালা, কানপাশা, ঢেড়ি, হিরামঙ্গল কড়ি, মদন কড়ি, চক্রবালি, বালি, গৌরণী, পাশিয়া, কিরকি পাতা, কানফুল, সাইরবালি, উর বইলা, পিপিলাত, ঝুমকা, গুজি, দ্বিরজিক, ত্রিরাজিক, স্বর্ণমধ্য, বজ্রগর্ভ, ভুরিমণ্ডল, কর্ণপুর কর্ণিকা, শৃঙ্খল ও কর্ণেন্দু নামক অলংকার। কানের উপর নিচ সব জায়গায় অলংকার পরার রেওয়াজ ছিলো।
- ❖ গলার অলংকার– হার, চিক, চিকহার, হাঁসুলী, চার শীরি, কণ্ঠি, মাদুলী, তাবিজ, ধান তাবিজ, তেলরী, পাঁচলরী, সাতনরা পাতেশ্বরী, চম্পাকলি, মোহন মালা, ডালমালা, সিক্রি, গ্রীবাপত্র, প্রালম্বিকা, সীতাহার, সারিকা, ভ্রমর, নীল লবনিকা, বর্ণসর, বজ্র, শঙ্খলিকা, বৈকক্ষিক, ভরঃসূত্রিকা, দেবচ্ছন্দ গুচ্ছ, গুচ্ছার্ধ, গোল্ডন, অর্ধহার, মনবক, একাবলী, নক্ষত্রমালা, গজমতি প্রভৃতি।
- ❖ হাতের অলংকার– অঙ্গদ, তাড়, কেয়ুর, তাগা, আয়েন্ত পদক, মানতাসা, বাজু, কাঁটা বাজু, বাহু-সূতা, বিভা (পুরাতন মুদ্রায় গাথা), অনন্ত, জশম, টেইটি, বাক, নৌনাক, মাদুলী, কালসী, পঞ্চকা প্রভৃতি।
- ❖ হাতের অগ্রভাগের অলংকার– রত্নচূড়। এর মধ্যভাগ 'চূড়' সম্মুখভাগ ও উপরিভাগকে 'সরল' বলা হত। হাতপদ্ম বলয় থেকে সরু শিকলের সঙ্গে যুক্ত করে একটি পদ্ম হাতের পিঠে ঝুলিয়া তা থেকে পুনরায় শিকল টেনে আঙুলের আংটি সংযুক্ত করা হত। তাছাড়া কেয়ব বুলয়, বাউ চুড়ি, বালা, তারবালা, পৈঁছি, খাড়ু, কড়া, সামষাবাদ, আলীবাদ, পাটরীচূড়া, রুলি, কাঁকন প্রভৃতি হাতের কব্জিতে পরা হত। আঙ্গুরিক, মুদ্রা, মুদ্রিকা, অঙ্গুলি ও মুদ্রা আংটির নাম। আংটিতে নামাঙ্কিত করে তা দিয়ে সিল করার প্রথা থেকে মুদ্রা ও মুদ্রিকা নামের উদ্ভব।
- ❖ নিতম্বের অলংকার– চন্দ্রহার (২ থেকে ৫ লহর), সূর্যহার (এক লহর), বিছা (দু'তিনটি হার), গোথাসূতা, গোট, কোমর জের, কোমরধানী, কাঞ্চী, কিঙ্কিনী, মেখলা, কলাপ, কাঞ্চীদাম, জজ্ঞানমসুক, মশিরাসন প্রভৃতি।
- ❖ পায়ের অলংকার– পাস্তলি, খাড়ু, বাঁক খাড়ু, বাবেত খাড়ু, মল, মল্ল তোড়র, মঞ্জির, পায়েল, গুঞ্জুরী, নূপুর, ঘুঙ্গুর, কিঙ্কিনী, পাহুরা, পঞ্চম, কড়া, চাহাড়া, পদ্মচূড়, পাওপদ্ম, পদকণ্ঠক, বাক পাতা, মল ও আরসি। মুদ্রিকা আঙ্গুটি, চাহাল্লা, আঙ্গুস্তা, পোর ও উজবটিকা পায়ের আঙুলের অলংকার।[১১]

মুঘল শাসনামলে ঢাকার অলংকার শৈলীর বিকাশ

অলংকার শিল্পে সাবেক পূর্ববঙ্গের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র ছিল ঢাকা। ডঃ ওয়াইজের মতে (Tribes and Castes of East Bengal) বর্গী হাঙ্গামার ফলে নদীয়ার স্বর্ণকাররা গঙ্গা পার হয়ে এসে ঢাকায় বসতি স্থাপন করে। এদের পৈত্রিক পদবি ছিল পাল, সেন, শীল, মাণিক্য দে প্রভৃতি। ঢাকায় টাকশাল স্থাপিত হওয়ার পর এরা সোনা ধোয়ার কাজ করত।

টাকশাল উঠে যাবার পর এরা নিজেরাই সোনা ধোয়ার ব্যবসা চালায়। পরে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এ শিল্প প্রসার লাভ করে।[১২]
মহানগরী ঢাকা। প্রাচ্যের রহস্য নগরী বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা। ঢাকা মহানগরীর শিল্পচর্চার অন্যতম এক বিশেষ অধ্যায় হচ্ছে অলংকার শিল্প। ঢাকার রয়েছে গৌরবময় অতীত, ঐশ্বর্যমণ্ডিত ঐতিহ্য। এখানে মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়ে কেবল সুবে বাংলার রাজধানী স্থাপিত হয়নি, মুঘল স্থাপত্যের একটি বিশেষ ধারাও বিকশিত হয় ঢাকাকে কেন্দ্র করেই। মুঘল শাসনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ঢাকার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অনেক কিছু। রাজধানী হিসেবে ঢাকা নির্বাচিত হওয়ার ফলে কেবল সৈন্য-সামন্ত, আমির-ওমরাহ বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ এখানে বসবাস শুরু করেননি, বসতি গাড়ে কাজের অন্বেষণে আসা বিভিন্ন পেশার লোকজন–শিল্পী, কারিগর, ওস্তাগার এবং সংশ্লিষ্ট অন্যারা। এরা স্থান করে নেয় এক এক মহল্লায় গড়ে ওঠে হাট-বাজার। বারো মাসে তেরো পার্বণ উদযাপিত হয় রাজধানী ঢাকাতেও, আর সেই সঙ্গে মুসলমানদের ধর্মীয় ও অন্যান্য উৎসবাদি উদযাপিত হয় শানশওকতের সঙ্গে।[১৩]

ফিলিগ্রী বা তারজালির অলংকার

ঢাকার ফিলিগ্রী কাজের বহু প্রশংসা করেছেন এদেশে আসা বিদেশি বিজ্ঞজন তাদের বর্ণনায়। "টপগ্রাফি অব ঢাকা" (১৮৪০) গ্রন্থে টেলর বলেন, ঢাকার কারিগরগণ ফিলিগ্রী কাজে বেশ দক্ষ। বালা, হার, ইয়ারিং এবং আতরদান ও গোলাপ পাশ এরা নিখুঁতভাবে তৈরি করে। এসব জিনিস দেশের (ভারতবর্ষের) বিভিন্ন অঞ্চলে রপ্তানি হয়।" ১৯৬৬ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর অলংকার শাখা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে মসকালাইন (Maskelyne) বলেন যে ফিলিগ্রী বা তারের কাজের জন্য অল্পবয়স্ক বালকদের নিয়োজিত করা হত। কারণ তাদের কচি আঙুল ছাড়া এ সূক্ষ্ম কাজ ততটা সুন্দর করা যেত না। ভারতবর্ষের তারের কাজের জুড়ি প্যারিসের এ প্রদর্শনীতে অন্য কোথাও দেখা যায়নি। প্রাচীন গ্রিসের ফিলিগ্রীর কারিগরদের সঙ্গে কেবল এ শিল্পীদের তুলনা করা যায় বলে তিনি মন্তব্য করেন। এ সম্পর্কে তিনি আরও বলেন, "It had probably reached its limits of delicacy and design at a very archaic period and has made no real progress in recent time. উল্লেখ্য যে, তারের কাজের এত প্রশংসা মসকালাইন করেছেন, অবিভক্ত ভারতে তার প্রধান দুটি কেন্দ্র ছিল ঢাকা ও কটক। এছাড়া A Monograph On Gold And Silver Work In The Presidency of Bengal (Calcutta-1905) তদানীন্তন বাংলার অলংকার শিল্প সম্পর্কে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। এ গ্রন্থে ঢাকার কারিগরদের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়। এ কারিগরদের শিল্প কুশলতা চমকপ্রদ, তবে তাঁর মতে উদ্ভাবনী ও নমুনার নতুনত্বের দিক থেকে এরা কিছুটা সনাতনপন্থী।[১৪]

কলকাতার বড় বড় সোনা-রুপার অলংকারের দোকানের কারিগরদের জন্ম বুড়িগঙ্গার পারে। এদের পাথরের জড়াই-এর কাজ, সোনা-রুপার খোদাই এর কাজ ছিল সুনিপুন। তবে রুপার ফিলিগ্রী কাজেই এরা ছিল বিশেষভাবে সিদ্ধহস্ত। এ কাজে ভাটা পড়াতে পরবর্তী যুগে নকশি কাজে এরা নিপুণতা অর্জন করে। ঢাকার তৈরি বিদ্রীর কাজ করা ফুসি হুক্কা এককালে বাইরে বেশ সমাদর লাভ করেছিল। এর কারিগরদের নাম ছিল বিদ্রীসাজ। এ কর্মকারদের প্রশংসা করতে গিয়ে 'ঢাকার ইতিহাস' (কলকাতা ১৯১১) প্রণেতা যতীন্দ্রমোহন রায় বলেন, "স্বর্ণ ও রৌপ্যালংকারের উপর ইহারা এরূপ সূক্ষ্ম কারুকার্য ফলাইতে পারে যে তা দৃষ্টে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। ঢাকাই কর্মকারদের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহারা অতি অল্প পরিমাণ স্বর্ণ দ্বারা নানাবিধ অলংকার প্রস্তুত করিতে পারে। বাইরে অন্যান্য স্বর্ণের কর্মকারগণ এই বিষয়ে ঢাকার কর্মকাগণের সমকক্ষ নহেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে ঢাকার 'মেন্ডিলা' নামক ফিলিগ্রী কাজ ছিল সর্বোৎকৃষ্ট। মেন্ডিলা কাজের একটি আতরদানির মূল্য ছিল ৫০০ টাকা। ১৯০৩ সালে দিল্লির শিল্প প্রদর্শনীতে তাহা প্রেরণ করা হইয়াছিল। (George Watt- Indian Art At Delhi-London 1903).

লন্ডন থেকে ১৮৮৬ সালের অক্টোবরে প্রকাশিত The Journal of Indian Art (Vol. 1 no. 13, P-97) -এ 'Dhaka Filigre work' শীর্ষক একটি নিবন্ধে ঢাকার বিখ্যাত তারের কাজ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এতে বলা হয়, (১৮৮৬ সালের) সত্তর বছর আগে এ শিল্পকর্ম ঢাকায় প্রচলিত হয় বলে ভুল ধারণা পোষণ করা হয়, আসলে সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমল থেকে এ শিল্প এখানে বিদ্যমান ছিল। অধিকতর ভারী এ তারের কাজকে মেন্ডিলা বলা হতো। চুলের মত সূক্ষ্ম তার কেটে নমুনা মোতাবেক তা ঝালাই করা হতো। ইংরেজ আগমনের কিছুকাল পরে এ শিল্প লুপ্ত হয় সম্ভবত এর অত্যধিক মূল্যের জন্য। মুসলমান রাজা-বাদশাহরা ছিলেন এর পৃষ্ঠপোষক। সে সময়ও লন্ডনে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীর জন্য এ মেন্ডিলা কাজের কোন নমুনা সংগ্রহ করা যায়নি বলে জার্নালে উল্লেখিত হয়। ১৮১৮ সালের দিকে তা পুনঃ প্রবর্তিত হয় (Meyharj, পৃঃ ১৩৪)

এ জার্নাল প্রকাশকালে ঢাকার নবাবগঞ্জ ও চৌধুরী বাজারের সুবর্ণ বণিকরা ছাই ধোয়া খাঁটি রুপা থেকে এ সূক্ষ্ম তার তৈরি করত। যে ইস্পাতের পাতের ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে টেনে এ সরু তার বের করা হতো তাকে যন্ত্রী বলা হতো। এরপর এ তার চলে যেত সোনার কর্মকারদের কাছে। ঢাকায় শাঁখারি ও তাঁতি সম্প্রদায়ও এ কাজে নিয়োজিত ছিল, তবে তাদের কাজের তেমন সৌকর্য ছিল না।

কাগজে প্রথমে নকশা এঁকে সে নমুনা অনুসারে রুপার তারের একটি ফ্রেম তৈরি করা হতো যাতে করে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তারের টুকরাগুলো তাতে ধরে রাখা যায়। ফুল, পাতা, বোঁটা পৃথক পৃথকভাবে তৈরি করে তা ফ্রেমের মধ্যে বসিয়ে দেওয়া হতো। সোহাগা দিয়ে এসব ঝালাই-এর বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এ জার্নালে।

স্বর্ণকারের দোকানে ছাই ধুয়ে খাঁটি রুপা বের করে তার তৈরির কাজে পনেরজন ও ফিলিগ্রী কাজে আশিজন লোক এ সময় নিয়োজিত ছিলো। তাদের মাসিক মজুরি পাঁচ থেকে বিশ টাকা পর্যন্ত ছিলো। এর মাঝে ঠিকা কাজেরও প্রচলন ছিলো। মাসোহারা বা ঠিকা কাজের জন্য অগ্রিম টাকা দেওয়ারও রেওয়াজ ছিলো। তদানীন্তন জেলা প্রশাসকের প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, এ কাজের মহাজনরা বেশ সচ্ছল অবস্থায় ছিল, পক্ষান্তরে কারিগররা ছিলো দরিদ্র। উত্তম ফিলিগ্রী কাজ দু'টাকা তোলা দরে বিক্রি হতো, শাঁখারিদের তৈরি শিল্প সামগ্রী এক টাকা থেকে তিন ভাগের এক টাকা তোলা দরে বিক্রি হতো। বাৎসরিক উৎপাদন ছিলো তখন দু'হাজার তোলা, তবে চাহিদা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে সে সময় এ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষণ দৃষ্ট হয়েছিলো।

১৮৮৩ সালে ডিসেম্বর ৪ তারিখ থেকে ১৮৮৪ সালের ১ মার্চ পর্যন্ত কলকাতায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে ঢাকার তাঁতীবাজারের ভৈরব চন্দ্র কর্মকারের ২৭১ তোলা ওজনের পানদার, আতরদান ও গোলাপাশ একসাথে গ্রথিত একটি ফিলিগ্রীর কাজ প্রেরিত হয়, তার দাম ছিলো ৮৭৮ টাকা। (Official Report, Calcutta International Exhibition. Calcutta, 1895) Indian jewellery (Vol. II) গ্রন্থে হেন্ডলে বলেন, "Nowhere in India the art (filigree) is practised with greater success than in Dacca" বার্ডউড ঢাকা ও মুর্শিদাবাদে ফিলিগ্রী কাজের সৌকর্যে (great excellence) কথা উল্লেখ করেন তাঁর ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট অফ ইন্ডিয়া গ্রন্থে (পৃঃ ১৯৪)।

সে প্রদর্শনীতে স্থান পায় গিল্টিকরা ফিলিগ্রী কাজের নমুনাও। জাহাঙ্গীরের কাল থেকে মেন্ডিলা কাজে গিল্টি করার প্রথা প্রচলিত ছিলো এবং আলোচ্য সময় ঢাকার পাঁচজন কারিগর এ কাজ করতে পারত।

এ কাজে সে কালের তিনজন কুশলী কর্মকারের নাম পাওয়া যায় এ মূল্যবান পত্রিকায়। তাঁরা ছিলেন- জগবন্ধু কর্মকার, কৃষ্ণচন্দ্র কর্মকার এবং আনন্দ কর্মকার। এঁরা সবাই একই পরিবারের কৃতী সন্তান। এবং মার্গ সঙীতের মত এ কাজ ছিলো যেন তাঁদের 'ঘরানা' রীতি।[১৫]

Filigree (tarjali in Bangla) is an ornamental openwork made with twisted threads usually of gold or silver and widely used for jewellery since antiquity. The art consists in curling, twisting and plaiting fine, pliable threads of metal and uniting them at their points of contact with each other and with the groundwork by means of gold or silver solder and borax. The more delicate work is generally protected by a framework of heavier wire, brooches, crosses, earrings and other personal ornaments of modern filigree and generally surrounded and subdivided by bands of square or flat metal (Encyclopedia Britannica, 1968). Filigree is used as a decorative treatment for jewellery or other fine metal work. It was made in ancient Egypt, China

and India. From the 6^{th} to the 3^{rd} century B.C. the Greeks practiced the art (The Columbia Encyclopedia, 1993).

Once Dhaka was famous for its filigree work. However, no detailed study or survey has been conducted on this graceful work. Dhaka was known as a prosperous city in the seventeenth century. With the flow of gold and silver, craftsmanship of filigree work also emerged under patronage of the Mughals. This is said to have disappeared shortly after the arrival of the English, owing most probably to its heavy price (The Journal of Indian Art, Oct., 1986). However, the silver filigree-work got its way again in the nineteenth century. The zamindars were the patrons of this filigree work. The work is still practiced in a few areas of Dhaka and Comilla. However, it lacks the fineness of the original work.

With the creation of the Department of Ethnography and Decorative Art in 1972 the Bangladesh National Museum started collecting the filigree work. It had, however, some good collections from the Baldah Museum. Today the National Museum has the largest collection of Dhaka filigree work.[১৬]

বিভিন্ন জটিল জ্যামিতিক নকশা এবং ফুল, পতঙ্গ, পাখি, লতাপাতার মোটিফ ব্যবহার করে প্রস্তুত করা হতো জালি কাজ, যেগুলোর লেসের মত সৌন্দর্য ছিল বিস্ময়কর। তাহলে জেনে নেয়া যাক ফিলিগ্রী কউ? ফিলিগ্রী হলো সোনা বা রুপা দ্বারা তৈরি তারের এক প্রকার কারুকাজ। একে বাংলায় তারজালি কারু কাজ বলা হয়। তবে নানা ধরনের অন্যান্য সৌখিন দ্রব্যেও এর ব্যবহার হতে পারে, যেমন আতরদান, গোলাপাশ দুক্কা, তাস-বাকসো, পানের বাটা, বোতাম, খোপার কাঁটা, ক্রুশ, বকলেস ইত্যাদি। গলার হার, কানের দুল, হাতের চুড়ি, আংটি, মাথার টিকলি ইত্যাদির মধ্যে এ ধরনের তারজালি কাজ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এজন্য এটি অলংকারেরই অঙ্গীভূত একটি ব্যাপার বলে সাধারণভাবে পরিগণিত।

তারজালি কাজের সাধারণ ধরন হল কোনো একটি বস্তুর ওপর সূক্ষ্ম তারের বৈচিত্র্যপূর্ণ কাজ। তার দ্বারা বাঁকানো কিংবা বিনুনীর মতো অলংকরণ করা হলো এর মূল বৈশিষ্ট্য। সাদামাটা ধরন থেকে বিশেষ ধরনের কারুকাজসহ মণিমুক্তা কিংবা মূল্যবান গুটিকা খচিত করে এ কাজ হতে পারে। এমন কাজ খালি হাতে করা অসম্ভব বলে অতীতে কাঠের ওপর পিন লাগিয়ে বস্তুটি ইচ্ছেমতো তৈরি করা হতো। সাধারণত সোনা ও রূপা এর মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এই দ্রব্য দুটির ঔজ্জ্বল্য এবং চকচকে ভাব এমনিতেই এ কাজে এক বিশেষ সৌন্দর্য সৃষ্টি করে। কিন্তু আরো শোভন ও রূপময় করার জন্য কখনো বা এর ওপর এনামেলও করা হয়। দামি তারজালি কাজ ফাঁকা এবং ফাঁকা ধরনের হয়ে থাকে।

ঢাকা এক সময় তারজালি কাজে খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। টমাস হলবেইন হেন্ডলে 'ইন্ডিয়ান জুয়েলারি' গ্রন্থে বলেছেন যে, ভারতের আর কোথাও ঢাকার মতো

এমন সাফল্যের সঙ্গে এই শিল্পের চর্চা হতো না। সম্ভবত উড়িষ্যা তথা কটক থেকেই ঢাকায় এর আগমন।

ফিলিগ্রী বা তারজালি কাজের এক বিরাট অংশ করত আট থেকে দশ বছর বয়সী কিশোররা। এরা সাধারণত হতো কারিগরদের সন্তান কিংবা শিষ্য। এদের কচি আঙুল এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি এ কাজের সাফল্যের জন্য খুবই দরকার ছিল। মুখ্য কারিগর মালমসলা তৈরি করে দিত, আকৃতিও বানিয়ে দিত। প্রথমে তার তৈরি করে পরে তা দিয়ে বিভিন্ন আকারের রূপ দেয়া হতো। মূল অংশগুলো দিয়ে সরাসরি বিভিন্ন আকার করা হতো এবং বড় অংশগুলো ছোটগুলোর সঙ্গে জোড়া দিয়ে জিনিস তৈরি করা হতো। অত্যন্ত নিপুণ হাতে এসব কাজ করতে হতো। সামান্যতম ভুলে বস্তুটির রূপ বিসদৃশ হয়ে যেতে পারত।

রুপার একটি পাতা কিংবা পাপড়ি তৈরি করে কোন এক বালকের হাতে দেওয়া হলে, সে তা প্রয়োজনীয় আকারে কেটে তর্জনী আঙুল ও তালুতে ধরে আধা ভাঁজের মত করে কাঠামোটির মধ্যে তরতর করে ঢোকাতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না অভ্যন্তরভাগ ভরে যায়। সেটি সে অতঃপর মুখ্য কারিগরের কাছে দেয়। সে তা ঝালাই লকা দিয়ে অভ্রের মধ্যে চুবিয়ে রাখে, এরপর চুলার ওপর সেটি গরম করে কাঠামোটিতে সে জোড়া লাগায়। এভাবে পাতার পর পাতা এবং পাপড়ির পর পাপড়ি ইচ্ছেমতো তৈরি করা যায়। তারপর তা সাফসুতরো করে ঝকমকে ঔজ্জল্য আনা হয়। ঔজ্জ্বল্য আনার বিষয় গোপনীয় কাজ, কায়দাটি সকলকে জানতে দেওয়া হয় না।[১৭]

ফিলিগ্রী আসলে অত্যন্ত সূক্ষ্ম বৈচিত্র্যময় ও রুচিশীল কারুকাজ। এর জন্য প্রয়োজন অপরিসীম ধৈর্য, বিশেষ দক্ষতা এবং উন্নত মনন। মেশিনে তৈরি যে কোন জিনিসের চেয়ে হাতের ফিলিগ্রী কাজ অনেক বেশি সুন্দর এবং বাস্তব। অথচ বিগত কয়েক দশক থেকে এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কাজ ঢাকা থেকে যেন বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। এখন এর নিদর্শন কেবল জাদুঘরেই পাওয়া যায়। নতুন করে এই ধারায় বিভিন্ন জিনিস আবার বাংলাদেশে তৈরি শুরু হয়েছে বলে শোনা যায়।

শঙ্খের অলংকার

ঢাকার অলংকার শিল্পের একটি ব্যতিক্রমী ধারা হচ্ছে শঙ্খ শিল্প বা শাঁখা শিল্প। ঢাকার শাঁখা দেশজ ব্যবহারিক ঐতিহ্যবাহী শিল্প সামগ্রীর মধ্যে অন্যতম। পারভিন আহমেদ এ বিষয়ে বলেন, Bangladesh has been the home of this unique craft over the centuries. Hidden away in the bylanes of Dacca's old city a hundred or so artisan families are the remnants of the most talented conch-shell carvers of the subcontinent. Work rooms integrated closely to their living accommodation, these craftsmen cut, shape and embellish milkwhite sea shells into elegant bangles, rings, hair clips and broaches.[১৮]

ঢাকার শাঁখারীবাজারে খোদিত নকশাঙ্কিত শাঁখা সারা দেশে প্রশংসিত। যারা শঙ্খের কাজ করে তারা শাঁখারি নামে পরিচিত। প্রায় হাজার বছর আগে সেন রাজাদের আমলে শাঁখারিরা ঢাকার অদূরে বিক্রমপুর রাজা বল্লাল সেনের পৃষ্ঠপোষকতায় বসবাস শুরু করে। সুলতানি আমলে সোনারগাঁয়ের কাছে লাঙ্গলবন্দের নিকটে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে তারা ব্যবসাকেন্দ্র গড়ে তোলে। পরে মুগল আমলে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে ঢাকার বর্তমান ইসলামপুর ও তাঁতীবাজারের মাঝামাঝি স্থানে শাঁখারী বাজারে নিষ্কর জমিতে এরা বসবাস করতে থাকে। শাখাঁর ব্যবসা এখানে সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে।[১৯]

শাঁখা শিল্পের যে মূল উপাদান তা হলো শঙ্খ, যা আদিতে মালয় উপসাগর হতে সংগ্রহ করা হতো। তবে আজকাল মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা, ভারতের মাদ্রাজ থেকে এগুলো ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়।[২০]

ঊনবিংশ শতক পর্যন্ত শঙ্খ থেকে শাঁখা তৈরি পর্যন্ত প্রস্তুতি পর্বকে তিন ভাগ করা হতো। প্রথমে শাঁখ বা শঙ্খকে পরিষ্কার করে এর ছুঁচলো অংশ ভেঙে ফেলা হতো। দ্বিতীয় পর্যায়ে শাঁখের করাত নামক হাত চালিত যন্ত্রের মাধ্যমে শাঁখ কেটে বলয় বানানো হতো। তৃতীয় পর্যায়ে শাঁখা ঘষে ও সামান্য রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে মসৃণ করা হতো। শেষ পর্বের কাজটি শিল্পীর নিজস্ব।[২১]

শাঁখা বা শঙ্খ বলয় একেবারে গোলাকার নয়। এটি হাতের সুডৌল গড়নের ধাঁচে গড়া বা কাটা। একজন শাঁখা শিল্পী তার মনের মত নকশা করে। বছরের পর বছর বাংলাদেশে নিঁখুত মোটিফ খোদাই করে তৈরি করে যে শাঁখারি, তার নেই কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। যুগ যুগ ধরে ব্যবহার করা ও একই চিন্তার ক্রমাগত বিস্তারের ফসল হিসেবে মোটিফগুলো পাওয়া যায় এবং এদের মধ্যে সামঞ্জস্য দেখা যায়। সকল মোটিফ শিল্পীর নিজস্ব পরিবেশ থেকে গ্রহণ করা। প্রায় পঁয়ত্রিশ রকমের কাঁটা বা খোদিত নকশার সন্ধান পাওয়া গেছে। এগুলোর মধ্যে চওড়া শাঁখার নকশা বেশি স্পষ্ট, তবে নিম্নমানের। অপেক্ষাকৃত সরু শাখার নকশা অতি সূক্ষ্ম ও মার্জিত। এগুলোকে আধুনিক নকশা বলা যেতে পারে।

শাঁখার নকশার রয়েছে বহু নাম। যেমন– শঙ্খসারি নকশা, মকরমুখী নকশা, মৎস্যরাজ নকশা, প্রজাপতি নকশা বা মিলন নকশা, কলমি ফুল নকশা, কলকে নকশা, পদ্মকলি নকশা, ধানছড়ি নকশা, ছোট ফুলকলি নকশা, শাপলা কলি নকশা, মানে না মানা নকশা, জালি-প্যাঁচ নকশা, দার্জিলিং নকশা, লিচুদানা নকশা, গোলাপ নকশা, পাতা নকশা, শাপলা পাপড়ি নকশা, শিউলি নকশা, গাঁদা ফুল নকশা, বেলফুল কলি নকশা, পানসা নকশা, রামলক্ষ্মণ নকশা, ডোরাকাটা নকশা, বাচাদার নকশা, খায়েশা নকশা, টানা নকশা, বাঁশরেখী নকশা, মাছরাঙা ফুল নকশা, শিঙরাকাটা নকশা, ফুল তরঙ্গ নকশা, রঙিলা নকশা, হিজল ফুল নকশা, হীরামন নকশা ইত্যাদি। এসব নামের ভেদে গুণগত পার্থক্য হয় না। শাঁখার উৎকীর্ণ নকশাগুলোর সাথে ঢাকার ঐতিহ্যবাহী মসলিনের নকশার মিল আছে বলা চলে। কেননা আধুনিক জামদানিতে মসলিনের

নকশা সংবলিত হয়েছে বলা হয় এবং জামদানিতে করা পাতা, ফুল নকশাগুলোর সাথে শাঁখায় খোদিত পাতা ও ফুলের মিল দেখা যায়।[২২]

শঙ্খ দিয়ে শুধু হাতের চুড়ি তৈরি করা হয় তা নয়, বরং কানের টপ, খোঁপার কাঁটা, চুলের ক্লিপ, শঙ্খের মালা, ঘড়ির চেন, আংটি, বোতাম, ব্রাশ, ব্যাংগেল, ব্রেসলেট ইত্যাদি অলংকার।[২৩] কালের পরিক্রমায় সাংস্কৃতিক পট পরিবর্তনের সাথে সাথে শাঁখার ব্যবহার অনেক কমে গেলেও হিন্দু রমণির অত্যাবশ্যকীয় অলংকার হিসেবে এটি আজও টিকে আছে। শৈল্পিক গুণাবলীতে অনন্য এই শাঁখা শিল্প ঢাকার অলংকার বিষয়ক আলোচনায় উজ্জল ও গুরুত্বপূর্ণ এক অধ্যায়, যার গর্ব আজও আমরা করতে পারি।

একটি শঙ্খ তৈরিতে অসম্ভব নিষ্ঠা ও কর্মদক্ষতা প্রয়োজন। শঙ্খশিল্পীরা শৈশব থেকেই এই কৃৎকৌশল আয়ত্ত করে। নতুবা এই কাজে যে শারীরিক দক্ষতা ও যোগ্যতার প্রয়োজন হয়, তা অর্জন করা কষ্টসাধ্য। একটি ভালো আকৃতির শঙ্খ থেকে মাঝারি ধরনের শাঁখা পাওয়া যায় সর্বোচ্চ চারটি, তবে সরু শাখা হলে দশটি পর্যন্ত পাওয়া সম্ভব। একজন দক্ষ শিল্পীর একটি নকশি শাঁখা প্রস্তুত করতে এক থেকে দেড় মাস সময় লেগে যায়।[২৪]

শঙ্খ আমাদের অলংকারের ইতিহাসে একটি অতি প্রাচীন স্মৃতি বহন করে। শাঁখা সিঁদুর সনাতন হিন্দু ধর্মের চিহ্ন। হিন্দু সধবা মেয়ের জন্য হাতের শাঁখা অপরিহার্য একটি অলংকার। বিয়ের সময় গায়েহলুদের দিন ধানদূর্বা সিঁদুর দিয়ে একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শঙ্খের বালা নবপরিণীতাকে পরানো হয়। স্বামীর মৃত্যুতে এ শাঁখা ভেঙে ফেলা হয়। [২৫]

শাঁখার প্রাচীন নাম ‘গাড়া’। দু’হাজার বছরের পুরাতন শঙ্খের কাজ তামিলের প্রাচীন রাজধানী ফোরকাই এবং কাবেলের ভগ্নস্তপে আবিষ্কৃত হয়েছে। দাক্ষিণাত্যের শাঁখারিরা তখন ‘পারওয়া’ নামে অভিহিত হতো। হেরনল সাহেবের মতে চতুর্দশ শতাব্দীতে মালিক শকুর কর্তৃক টিনিভেলি জেলার হিন্দু রাজধানী অধিকৃত হতে শঙ্খ শিল্পীগণ সেকালের পূর্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকায় আগমন করেন। ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন কিন্তু এ মতে বিরোধিতা করে অনুমান করেন যে এখানকার শিল্প আরো প্রাচীন। বিদ্যাপতি চণ্ডিদাসের কাব্যে শাঁখার উল্লেখ থেকে এ উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হয়। ‘টঙ্কা ভেংগে শঙ্খ দিলাম কনে সদন কড়ি’ একটি প্রাচীন বাংলার ছড়ার পংক্তি। ষোড়শ শতাব্দীতে Garchia De Orta ও সপ্তদশ শতাব্দীতে Boccaro শঙ্খ ব্যবসা ও শিল্প সমন্ধে আলোচনা করেন। টেভারনিয়ারের মতে সপ্তদশ শতাব্দীতে ঢাকা ও পাবনায় আনুমানিক ২০০০ শাখারি কাজ করত বলে উল্লেখ করেন। টেলর তার ‘টপগ্রাফি অব ঢাকা’ গ্রন্থে (পৃঃ ১৮৪) ঢাকা শহরে ৫০০ জন শঙ্খের কারিগরের কথা উল্লেখ করেন।

সাময়িক মেলার সময় তখন বহু কুঁদান ও রঙিন শঙ্খের অলংকার ও জিনিসপত্র বিক্রি হতো বলে তিনি উল্লেখ করেন।[২৬]

ঢাকার শাঁখারী বাজারে ১৪২টি বাড়ি আছে। বর্তমানে এ পেশা ছেড়ে অনেকে অন্য কাজ করছে। তবে ১৪টি ঘরে এখনো শাঁখার কাজ হয়।

স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলংকার

ঢাকার অলংকার শৈলীর অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে- সোনা ও রুপায় তৈরি অলংকার। এটি অলংকার শিল্পের বিশাল স্থান দখল করে আছে। গুণগত দিক দিয়ে এগুলো যেমন উন্নত, তেমনি শৈল্পিক বিচারে ও শিল্প মানে অনন্য। সোনা-রুপার অলংকার তৈরির কাজের কয়েকটি শ্রেণি বিভাগ হলো নকশি, ফিলিগ্রী বা তারের কাজ, খোদাই বা ছিলা, ডাইস ও মিনা করা।

নকশি কাজে ইটের গুঁড়া ও তেল একসঙ্গে মিশিয়ে তার উপর সোনা-রুপার পাতলা পাত বিছিয়ে ছোট ছোট হাতুড়ি পিটে ইচ্ছানুরূপ নকশা করা। পাত উল্টিয়ে তাতে সূক্ষ্মতার কাজ করা হয়।

ফিলিগ্রী বা তারের কাজের জন্য সোনা-রুপার তার যন্ত্রী নামক হাতিয়ারের সূক্ষ্ম ছিদ্রের মধ্য দিয়ে টেনে ইচ্ছানুরূপ সরু করে নিয়ে কেটে নির্দিষ্ট নমুনায় সাজানো হয়।

সোনা-রুপার অলংকারের উপরিভাগ চোখা ত্রিকোণাকার করে কেটে নকশা করার নাম খোদাই বা ছিলার কাজ।

বিভিন্ন নমুনার লোহা ও ডাইসের ভিতর পাতলা সোনা ও রুপার পাত বসিয়ে তার উপর সীসা রেখে আস্তে আস্তে পিটে নকশা বের করা হয়। উল্টা পিঠের ফাঁপা অংশকে অনেক সময় লাক্ষা দিয়ে ভরে দেওয়া হয়।

সোনা রুপার ওপর নমুনা মোতাবেক খোদাই করে তাতে ডিজাইন অনুসারে রং বসিয়ে মিনা করা হয়।[২৭]

সোনার গহনা তৈরির জন্য প্রথমত সোনা গলানো, দ্বিতীয়ত নকশার কাজ, তৃতীয়ত ছিলাইয়ে কাজ এবং শেষে পলিশের কাজ– এ চারটা ধাপ অতিক্রম করে পর্যায়ক্রমে তৈরি করা হয় অলংকার।

পূর্বে মাটিতে একটা গর্ত, একটা পাখা বা ফুঁ নল আর কয়েকটি অতি সাধারণ হাতিয়ার দিয়ে নকশা ফোটানোর কাজ করত স্বর্ণকারেরা। বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতির ব্যবহার হয়।

ঢাকার সোনা-রুপার অলংকারের জুড়ি মেলা ভার। বৈদিক আর্যদের কাল থেকে এ উপমহাদেশে সোনা-রুপার অলংকারের প্রচলন সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। হান্টারের 'ইম্পোরিয়াল গেজেটিয়ার গ্রন্থে পূর্ববঙ্গ খণ্ডের বর্ণনা থেকে বাংলাদেশে সোনা-রুপার কাজ সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়– "এখানে সোনা-রুপা ও পাথরের কারিগরের সংখ্যা বাংলার অন্যান্য অঞ্চল থেকে অধিক। সোনা-রুপার উপর এদের পাথরের জাড়াই এর

কাজ নিঁখুত। রুপার ফিলিগ্রী কাজেও এরা দক্ষ কারিগর। এ ব্যাপারে ঢাকার অলংকার শিল্পীদের খ্যাতির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে শুধুমাত্র কটকের কারিগরগণ”[২৮]

ঐতিহাসিক নগর সোনারগাঁ ভ্রমণে এসে ব্রিটেনের রানী প্রথম এলিজাবেথের দূত র‌্যালফ ফিচ রমণীদের প্রচুর অলংকার ব্যবহার করতে দেখেছেন এবং সে বিষয়ে বর্ণনাও দিয়েছেন। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে আগত পর্যটক ট্যার্ভিনিয়ের, ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ের অথবা ম্যানরিক যে বর্ণনা দিয়েছেন সেই বর্ণনাও প্রমাণ করে অত্র অঞ্চলের মানুষ ধনসম্পদের অধিকারী ছিলেন। ‘বাহারিস্তান-ই-গায়েবীর’ লেখক মীর্জা নাথনের বর্ণনা থেকেও (সপ্তদশ শতক) এর প্রমাণ মেলে। এ সকল তথ্যের ভিত্তিতে ঢাকা তথা বাংলাদেশ যে অলংকার শিল্পে উন্নতি করেছিল সে কথা মনে করা হয়।[২৯]

বাংলার মুসলমানদের আগমনের পর এদেশীয় কারিগরেরা অলংকার শৈলীতে নতুনত্ব প্রদর্শন করতে থাকল। নতুন নকশা ও পদ্ধতি তারা গ্রহণ করল নতুন পৃষ্ঠপোষকদের সন্তুষ্টি লাভের জন্য। এর মানে এই নয় যে গহনার প্রাচীন নকশা ও ধারণাগুলো পরিত্যক্ত হয়েছিল, সেগুলোও তৈরি হতে থাকল। পাশাপাশি দেখা যায় ছোট ও বড় মূল্যবান রত্নের বহুল ব্যবহার। যেগুলো স্বর্ণের পাতলা পাতের ওপর বসিয়ে কুন্দল নামে পরিচিত সুন্দর গহনা প্রস্তুত করা হতো।[৩০]

ইউরোপীয় প্রভাবে এখানকার নকশাকারেরা স্বর্ণে খাঁজ কাটার কৌশল প্রবর্তন করে যা ‘ডায়মন্ড কাট’ নামে পরিচিত। এটি গয়নাকে বাড়তি উজ্জ্বলতা দেয়। ইউরোপীয় প্রভাবের ফলে অতর্কিত পাথরের পরিবর্তে গহনায় বসানো হয় কাটা এবং পালিশ করা পাথর, যেগুলো ছিল আকারে ছোট এবং সীমিত মূল্যের। কুন্দন পদ্ধতিতে পাথর বসানোর পরিবর্তে দেখা যায় পশ্চিমের আংটা দিয়ে পাথর বসানোর প্রচলন। মূল্যবান পাথরের দুষ্প্রাপ্যতার কারণে গহনা নির্মাতারা বাধ্য হয় অধিক পরিমাণে স্বল্প মূল্যের পাথর এবং স্ফটিক ব্যবহার করতে। এ সময় সোনার উঁচু করে পেটানো নকশার কাজের গহনা জনপ্রিয়তা পায়। এ নকশা কাজের জন্য ঢাকা সুপরিচিত ছিল। তবে মুঘলদের সময়ে প্রবর্তিত স্বর্ণ ও রৌপ্যের তারজালি কাজ অভিজাত সম্প্রদায়ের নিকট জনপ্রিয় থেকে যায়। বিশেষভাবে ঢাকার গহনা কারিগরদের উৎপন্ন এ দ্রব্য খুবই সমাদৃত ছিল, কারণ বেশ ভারী হওয়া সত্ত্বেও লেসের মতো নকশার কারণে গহনাগুলো কমনীয়তা ও ভঙ্গুরতার এক বিভ্রম সৃষ্টি করত।[৩১]

এরপর নানা রাজনৈতিক পট পরিবর্তন অলংকার শিল্পের প্রবহমান ধারায় প্রচণ্ডরকম প্রভাব ফেলে। দুটি বিশ্বযুদ্ধ এবং তার পরবর্তী রাজনৈতিক অভ্যুত্থান, স্বাধীনতা, উপমহাদেশের বিভাজন এবং চূড়ান্তভাবে বাংলাদেশের উত্থানের পর মূল্যবান ধাতু ও পাথরের দাম ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়, যার ফলে স্বর্ণের গহনা ব্যবহারের বিরাট পরিসরের সংকোচ ঘটে এবং এতে অলংকার প্রস্তুত কৌশল আরও পরিবর্তিত হয় এবং নতুন পদ্ধতি, শৈলী ও মাধ্যম অবলম্বন করতে হয়।

এসময় ঢাকায় অলংকার তৈরিতে স্বর্ণের সাথে মুক্তার ব্যবহার ব্যাপকহারে বেড়ে যায়। এসময় অলংকার যেমন সীতাহার, মানতাসা, টানা, ঝুল এগুলোতে স্বর্ণের চেনের পরিবর্তে মুক্তার ব্যবহার লক্ষণীয় ছিল। পাশাপাশি স্বল্প মূল্যের পাথরের তৈরি অলংকারও দেখা যায়। ১৯৮৮ সালে পাথরখচিত স্বর্ণালংকারের বিপুল ব্যবহার ছিল কিন্তু ১৯৯৫ এর পর অলংকারের নকশায় পরিবর্তন এল পাথর ও মুক্তার ব্যবহার অনেকাংশেই কমে গেল। স্বর্ণালংকারের পাশাপাশি এ সময় রুপার তৈরি অলংকারের চাহিদা বাড়তে লাগল এর স্বল্প মূল্যের জন্য। এছাড়া হালকা ওজন, ব্যতিক্রমী আবেদনের কারণে ফ্যাশন সচেতন আধুনিক নারীদের কাছে রুপার অলংকার অনেক আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে লাগল। রুপার এসমস্ত অলংকারে কাঁচের পুঁতি, স্বল্প মূল্যের পাথর, স্ফটিক, রঙিন পাথর ব্যবহৃত হয়েছে। দশ-বারো বছর ধরে রুপার অলংকারের ওপর স্বর্ণের প্রলেপ বসিয়ে অন্য মাত্রা দেওয়ার প্রবণতা অলংকার প্রেমীদের কাছে বেশ গ্রহণযোগ্য হয়েছে।[৩২]

মুসলমান সম্প্রদায়ের ব্যবহৃত অলংকারের এ সকল তথ্য এবং ব্যবহৃত অলংকারের আলোকে মুসলিম অলংকারের বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়

১. সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জটিল নকশা
২. অলংকারে ব্যাপক মণি-মুক্তা ও পাথরের ব্যবহার
৩. বৃহৎ আকৃতির অলংকার
৪. দীর্ঘ বা লম্বা মালা
৫. এনামেলের সাহায্যে অলংকারকে উজ্জ্বলকরণ এবং
৬. অলংকারে চাঁদতারার ব্যবহার।[৩৩]

মানুষের মুর্তি ইসলামে নিষিদ্ধ থাকায় মুসলিম অলংকারে এর ব্যবহার লক্ষ করা যায় না। তবে ময়ূর, অন্যান্য পাখি এবং মাছের আদলে অলংকার প্রস্তুতের নিদর্শন লক্ষ করা যায়। এ সকল মোটিফ কানের, গলার এবং অন্যান্য অলংকারে ব্যবহার করা হয়েছে। এ সকল মোটিফ কানের, লতা এবং পাতার মোটিফ অবলম্বনে অলংকার তৈরি করা হয়েছে। চাঁপা ফুলের পাপড়ির আদলে তৈরি গলার হার হিন্দু এবং মুসলমান রমণীদের অতি প্রিয়।[৩৪]

আধুনিক ঢাকার অলংকার শৈলী

আজকের ঢাকার অলংকার শিল্প কেমন– যদি এই আলোচনায় যেতে চাই তাহলে সে হবে সম্পূর্ণ অন্যরকম একটা যাত্রা। আধুনিক যুগে অন্য সব শিল্পের মতই মাধ্যমগত ভিন্নতা অলংকার শিল্পকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা অতি উন্নত হওয়ার তাগিদে এখন এ সময়ের শিল্পীরা অহরহ অলংকার তৈরিতে বিচিত্র রকমের উপাদান

ব্যবহার করছে। অলংকার শিল্পকে কারুকলা হতে চারুকলার পর্যায়ে নেওয়ার প্রয়াস লক্ষণীয়।

বর্তমানকালে যাত্রা, আড়ং নামের প্রতিষ্ঠান অলংকার শিল্প নিয়ে প্রচুর কাজ করছে এবং অহরহ নিত্যনতুন ডিজাইনের অলংকার বাজারজাত করছে। কাপড়, প্লাস্টিকের পুতি, ফলের বীজ প্রভৃতি রুপা, সোনা, তামা, ব্রাস এর সমন্বয়ে ফিউশন তৈরি করে অলংকার তৈরি করছে, যা বর্তমান যুগের নারীদের কাছে গ্রহণযোগ্যতাও পেয়েছে। এছাড়া মৃৎশিল্পীদের তৈরি মাটির অলংকার, বেদেদের সংগ্রহের মুক্তার অলংকার বেশ জনপ্রিয়।

আসলে ঢাকার অলংকার শিল্প আলোচনা এই স্বল্প পরিসরে সহজ নয়। ঢাকার বিশেষত পুরনো ঢাকার ঘরে ঘরে বর্ষীয়ান যাঁরা জীবিত আছেন তাঁদের বর্ণনায় পাওয়া যায় ঢাকার অলংকার শিল্পের জৌলুস কেমন ছিল। তাঁদের ব্যক্তিগত সংগ্রহ যা উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁরা তাঁদের পরিবার থেকে উপহার হিসেবে পেয়েছেন সেগুলো দেখলেই বোঝা যায়। বিভিন্ন ধরন গড়ন এর এত সুন্দর সুন্দর অলংকার বিশেষ করে স্বর্ণালংকারগুলোর নকশা, ফর্ম এত অনন্য ছিল, যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। নিরাপত্তার স্বার্থে এগুলো আজ বাক্সবন্দী হয়ে লকারে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছে। তবু বলতে পারি যুগ-যুগান্তরের ঢাকার অলংকার শিল্পের এই জয়যাত্রা অব্যাহত থাকুক।

তথ্য সহায়িকা

১. সম্পাদক লালারুখ সেলিম, চারু ও কারুকলা, এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭, পৃঃ ৫৭২।
২. ড. আব্দুস সাত্তার, অলংকার, একাত্তর প্রকাশনী, ২০১৮, পৃঃ ১৫।
৩. ড. আব্দুস সাত্তার, অলংকার, একাত্তর প্রকাশনী, ২০১৮, পৃঃ ৮০।
৪. সম্পাদক লালারুখ সেলিম, চারু ও কারুকলা, এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭, পৃঃ ৫৭২।
৫. তোফায়েল আহমেদ, আমাদের প্রাচীন শিল্প, বাংলা একাডেমি, ১৯৯২, পৃঃ ১৩২।
৬. তোফায়েল আহমেদ, আমাদের প্রাচীন শিল্প, বাংলা একাডেমি, ১৯৯২, পৃঃ ১৩২।
৭. সম্পাদক লালারুখ সেলিম, চারু ও কারুকলা, এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭, পৃঃ ৫৭৩।
৮. সম্পাদক লালারুখ সেলিম, চারু ও কারুকলা, এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭, পৃঃ ৫৭৪।
৯. সম্পাদক লালারুখ সেলিম, চারু ও কারুকলা, এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭, পৃঃ ৫৭৫।
১০. সম্পাদক লালারুখ সেলিম, চারু ও কারুকলা, এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭, পৃঃ ৫৭৬।
১১. তোফায়েল আহমেদ, আমাদের প্রাচীন শিল্প, বাংলা একাডেমী, ১৯৯২, পৃঃ ১৩৪-১৩৬।
১২. তোফায়েল আহমেদ, আমাদের প্রাচীন শিল্প, বাংলা একাডেমি, ১৯৯২, পৃঃ ১৩৯।
১৩. আব্দুল মতিন সরকার, ঢাকায় শিল্পচর্চা, সম্পাদক: আব্দুল মতিন সরকার, চারুকলা, প্রথম বর্ষ, ঢাকায় শিল্পচর্চা বিশেষ সংখ্যা, প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৪, পৃঃ ১৫।
১৪. তোফায়েল আহমেদ, আমাদের প্রাচীন শিল্প, বাংলা একাডেমি, ১৯৯২, পৃঃ ১৪০।

১৫. তোফায়েল আহমেদ, আমাদের প্রাচীন শিল্প, বাংলা একাডেমি, ১৯৯২, পৃ: ১৪১, ১৪২, ১৪৩।
১৬. Zinat Mahrukh Banu, FILIGREE WORK OF BANGLADESH NATIONAL MUSEUM, The Journal of Bangladesh National Museum, No. 4. January- June 2005, Page-99.
১৭. সৈয়দ আমীরুল ইসলাম, ঢাকার ঐতিহ্যবাহী ফিলিগ্রী বা তারজালি শিল্পকর্ম, সম্পাদক: আব্দুল মতিন সরকার, ঢাকায় শিল্পচর্চা (বিশেষ সংখ্যা) চারুকলা, প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৪, পৃ: ৭৫-৮৩।
১৮. Edited and compiled by : Parveen Ahmed, Craft from Bangladesh, Bangladesh Handicrafts Marketing Corporation, A subsidiary of Bangladesh Small & Cottage Industries Corporation, Page-16.
১৯।.ঢাকার শাঁখা শিল্প, হাবিবা খাতুন, সম্পাদক : আব্দুল মতিন সরকার, ঢাকার শিল্প চর্চা (বিশেষ সংখ্যা), চারুকলা, প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৪, পৃ: ৬১।
২০. ঢাকার শাঁখা শিল্প, হাবিবা খাতুন, সম্পাদক : আব্দুল মতিন সরকার, ঢাকার শিল্প চর্চা (বিশেষ সংখ্যা), চারুকলা, প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৪, পৃ: ৬৩।
২১. ঢাকার শাঁখা শিল্প, হাবিবা খাতুন, সম্পাদক : আব্দুল মতিন সরকার, ঢাকার শিল্প চর্চা (বিশেষ সংখ্যা), চারুকলা, প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৪, পৃ: ৬৪।
২২. ঢাকার শাঁখা শিল্প, হাবিবা খাতুন, সম্পাদক : আব্দুল মতিন সরকার, ঢাকার শিল্প চর্চা (বিশেষ সংখ্যা), চারুকলা, প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৪, পৃ: ৬৬।
২৩. বাংলাদেশের লোকশিল্পের রূপরেখা, শাওন আকন্দ, জার্নিম্যান-জলরং যৌথ প্রকাশনা, ২০১৩, পৃ: ১৩৮।
২৪. বাংলাদেশের লোকশিল্পের রূপরেখা, শাওন আকন্দ, জার্নিম্যান-জলরং যৌথ প্রকাশনা, ২০১৩, পৃঃ ১৩৮।
২৫. তোফায়েল আহমেদ, আমাদের প্রাচীন শিল্প, বাংলা একাডেমি, ১৯৯২, পৃ: ১২৮, ১২৯।
২৬. তোফায়েল আহমেদ, আমাদের প্রাচীন শিল্প, বাংলা একাডেমি, ১৯৯২, পৃ: ১৩৭, ১৩৮।
২৭. তোফায়েল আহমেদ, আমাদের প্রাচীন শিল্প, বাংলা একাডেমি, ১৯৯২, পৃ: ১৩৯।
২৮. তোফায়েল আহমেদ, আমাদের প্রাচীন শিল্প, বাংলা একাডেমি, ১৯৯২, পৃ: ১৩৯।
২৯. ড. আব্দুস সাত্তার, অলংকার, একাত্তর প্রকাশনী, ২০১৮, পৃ: ৮১।
৩০. জুলেখা হক, গহনা শিল্প, সম্পাদক লালারুখ সেলিম, চারু ও কারুকলা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭, পৃ: ৫৭৫।
৩১. জুলেখা হক, গহনা শিল্প, সম্পাদক লালারুখ সেলিম, চারু ও কারুকলা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭, পৃ: ৫৭৫।
৩২. সাক্ষাৎকার, সঞ্জয় ঘোষ, স্বর্ণকার, পুষ্পরাজ সাহা লেন, লালবাগ, ঢাকা, ১৬ আগস্ট, ২০২১।
৩৩. ড. আব্দুস সাত্তার, অলংকার, একাত্তর প্রকাশনী, ২০১৮, পৃ: ৪৩।
৩৪. ড. আব্দুস সাত্তার, অলংকার, একাত্তর প্রকাশনী, ২০১৮, পৃ: ৪৭।

পশ্চিমা আদলে রত্নখচিত স্বর্ণের নেকলেস হার ও দুল (আনু: ১৯৫০)

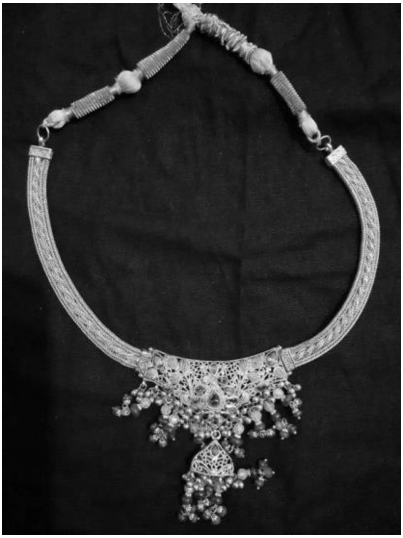

রত্ন ও পুঁতির সমন্বয়ে তৈরি স্বর্ণের ঝুলহার (আনুঃ ২০০৫)

পশ্চিমা আদলে রত্নখচিত স্বর্ণের নেকলেস হার (আনুঃ ১৯৫০)

রত্ন বসানো স্বর্ণের চিক হার, ঝুমকা ও টিকলি (আনুঃ ১৯৭৫)

পশ্চিমা আদলে রত্ন খচিত স্বর্ণের নেকলেস হার (আনুঃ ১৯৮৩)

মিনা করা ও পুতি সমন্বয়ে তৈরি হার (আনুঃ ১৯৯৫)

রুপার উপর স্বর্ণের প্রলেপ ও পুঁতির সমন্বয়ে তৈরি হার (আনুঃ ১৯৯২)

ঝিনুক বসানো ও মিনা করা লকেট (আনুঃ ১৯৫৫)

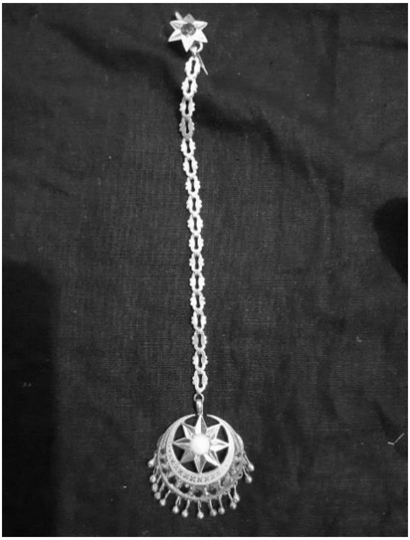

স্বর্ণের দুল (আনুঃ ১৯৭৫)

মিনা করা ও রত্নের সমন্বয়ে চাঁন তারা টিকলি (আনুঃ ১৯৫৫)

পাথর ও পুঁতির সমন্বয়ে আধুনিক ডিজাইনের দুল (আনুঃ ১৯৯৫)

স্বর্ণের ঝুমকা পাথর ও পুঁতি দ্বারা তৈরি (আনুঃ ১৯৭৫)

পাথর সেটিং টিকলি (আনুঃ ২০১০)

ঝিনুক বসানো স্বর্ণের পাশা (আনুঃ ১৯৫৫)

পুঁতির ঝোলানো স্বর্ণের প্রলেপ দেওয়া রুপার কানের দুল (আনুঃ ১৯৯২)

রত্নখচিত স্বর্ণের কানের দুল (আনুঃ ১৯৬০)

স্বর্ণের চুলের ক্লিপ (আনুঃ ১৯৫০)

পাথর, মুক্তা প্রভৃতি বসানো নাকফুল

রুপার চাবির রিং

মিনা করা পায়েল

স্বর্ণের বালা (২০১০)

মিনা করা গলার হার ও দুল

ঢাকার লালবাগের অধিবাসী সঞ্চয় ঘোষ স্বর্ণকারের ব্যক্তিগত সংগ্রহের ক্যাটালগে প্রাপ্ত বিভিন্ন রকমের অলংকারের নকশার চিত্র

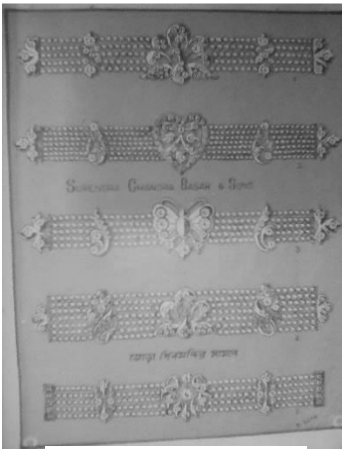

ব্রেসলেট

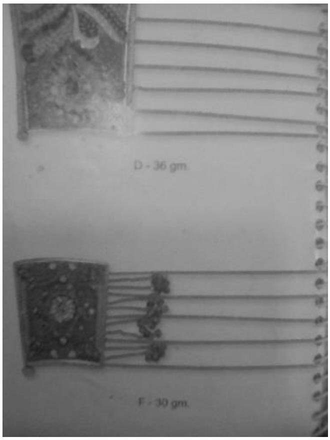

মানতাসা

ব্রেসলেট

রতনচূড়

রতনচূড়

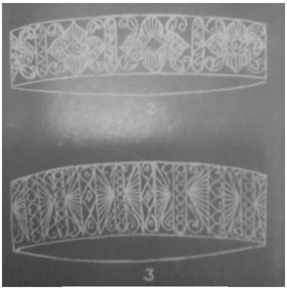

চূড়

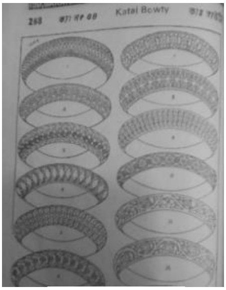

বাউটি

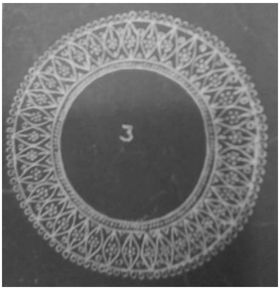

কঙ্কণ

হার

জড়োয়া হার

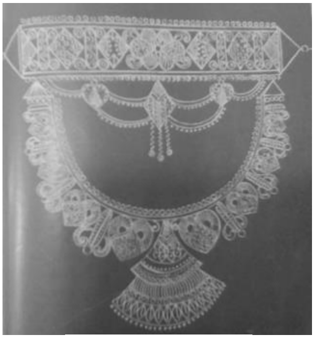

চিক হার

সীতাহার

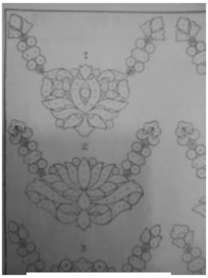
ঝুলহার

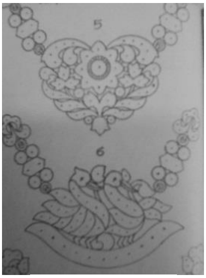
ঝুলহার

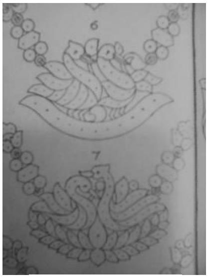
ঝুলহার

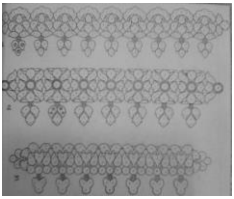
চিকহার

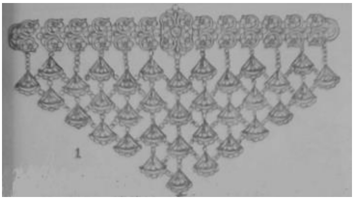
চিকহার

জড়োয়া

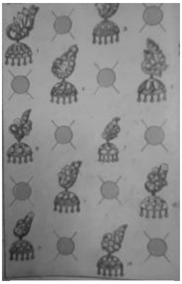
ঝুমকা

দুল

কানপাতা ঝুমকা

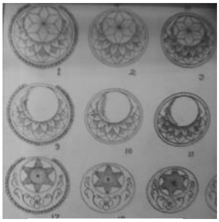
মাকরি দুল

মাকরি দুল

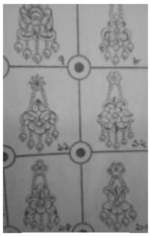
দুল

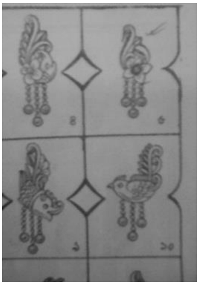

পাশা

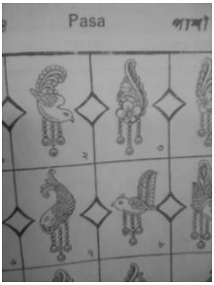

পাশা

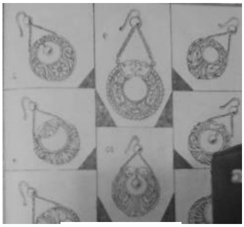

দুল

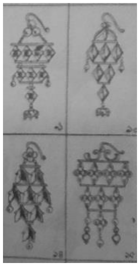

দুল

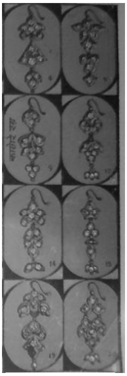

দুল

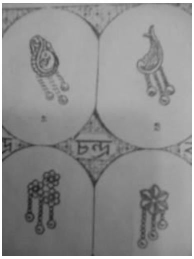

পাশা

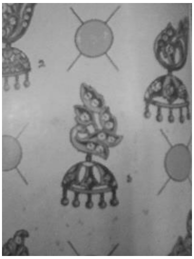

পাখির নকশার ঝুমকা

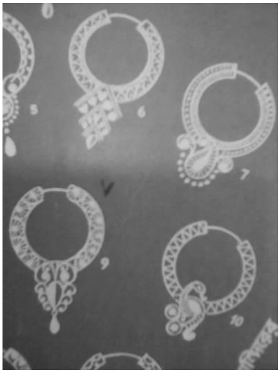

সাগরিকা দুল

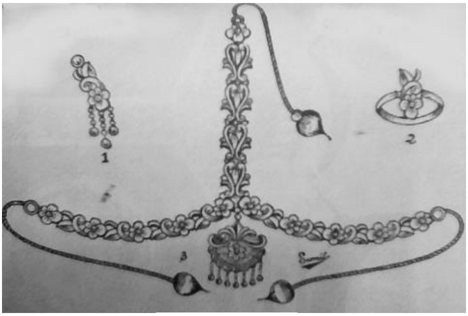

সিঁথিপাটি

মুকুট

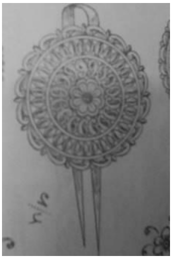
খোঁপার কাঁটা

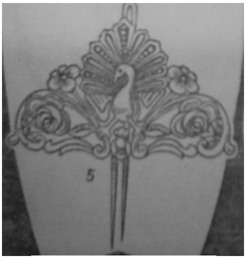
খোঁপার কাঁটা

খোঁপার কাঁটা

চিরুনি কাঁটা

ঝুমুর

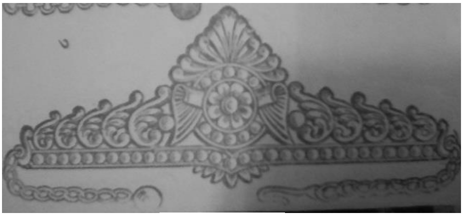
আর্মলেট

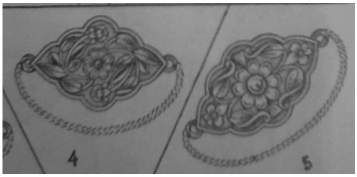
পদক

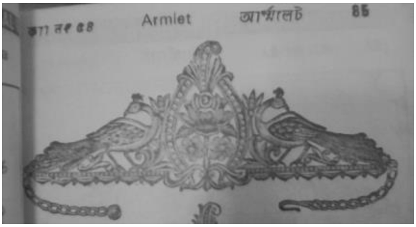
আর্মলেট

শঙ্খের বালা

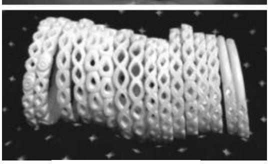
শঙ্খ ও বালা

কাঁচা ফুল ও পুঁতির সমন্বয়ে গায়েহলুদের অলংকার

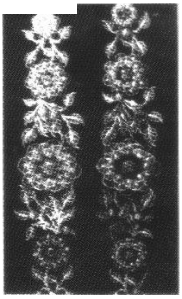
সূক্ষ্ম তারজালির অলংকার